অথবা

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি
Grounds of Political Obligation

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান ইস্যু হল রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। ব্যক্তি কতখানি, কখন এবং কেন রাষ্ট্রের আইন ও আদেশ মান্য করবে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলতে রাষ্ট্রীয় আদেশ, নির্দেশ এবং আইনের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্যশীল থাকাকে বোঝায়। নাগরিকগণ কী কারণে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, তারা কি কখনও রাষ্ট্রীয় আইন বা আদেশ ভঙ্গ করতে পারে— এই বিষয়টিই হল রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কেন্দ্রীয় বিষয়।

'রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Political Obligation। ল্যাটিন শব্দ Obligate থেকে Obligation শব্দটির জন্ম। জাস্টিনিয়াম ইনস্টিটিউট-এ বাধ্যবাধকতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি হল একটি আইনগত বন্ধন। এই বন্ধনের জন্যই মানুষ কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে পড়ে। **বার্কার** বাধ্যবাধকতাকে ব্যক্তিগত (Civil) এবং রাজনৈতিক (Political)—এই দুভাগে ভাগ করেছেন। ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা বলতে নাগরিক হিসেবে কোনো ব্যক্তি শাসন কর্তৃপক্ষের জন্য এক বা একাধিক কার্য সম্পাদনে দায়বদ্ধ থাকে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বলতে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধীন। কোনো কারণেই নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করতে পারে না। নিম্নে রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পর্কে মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হল :

(১) **আইনগত তত্ত্ব :** এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র হল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্র আইন তৈরি করে বলেই আইন সকলকে মান্য করতে বাধ্য। রাষ্ট্র একটি আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। আমাদের কাছে আইন সংগত-অসংগত যাই মনে হোক না কেন, আইন মান্য করতে আমরা বাধ্য। এই তত্ত্ব আইনের উৎসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, আইনের লক্ষ্য বা বিষয়বস্তুর ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না।

(২) **ঐশ্বরিক তত্ত্ব :** ঐশ্বরিক তত্ত্ব রাজনৈতিক আনুগত্যের তত্ত্ব সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ। রাজার আদেশ বা আইন অমান্যের অর্থ ঈশ্বরের আদেশ বা আইনকে অস্বীকার করা। তাই রাজার আদেশ ও আইনকে মেনে চলাই প্রজাদের কর্তব্য। এবং সেই কারণে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করতে পারে।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ঐশ্বরিক তত্ত্বের অস্তিত্ব অতীতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূখণ্ডেই প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে এই তত্ত্ব অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার্কারের মতে, এই তত্ত্বের ধরন-ধারণ ও আবরণ একটি অবলুপ্ত অধ্যায়ের সাক্ষী। গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে ঐশ্বরিক মতবাদকে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। শাসক, শাসকের আদেশ ও তাঁর প্রণীত আইন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না, তা বিচারের ক্ষমতা শাসিতের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি।

(৩) **বল প্রয়োগের তত্ত্ব :** এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকায় নাগরিকগণ রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রের আইনকে মেনে চলতে বাধ্য। ব্যক্তি রাষ্ট্র ও তার আইনকে অমান্য করলে চূড়ান্ত বলপ্রয়োগের ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র এই অমান্যকারী ব্যক্তিকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারে। আর এই শাস্তির ভয়েই ব্যক্তি রাষ্ট্র এবং আইনকে মান্য করে চলে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের ভিত্তি হল রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগমূলক ক্ষমতা। ব্যক্তি যেহেতু রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ব্যাপারে অতিশয় দুর্বল, সেহেতু তার রাজনৈতিক আনুগত্যও সীমাহীন। এই আনুগত্যের তত্ত্ব ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের আইন ন্যায্য কি অন্যায্য সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোনো অধিকার দেয় না। সেইজন্য এই তত্ত্ব রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি সম্পর্কে কোনো ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

(৪) **সম্মতির তত্ত্ব :** রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে সম্মতির তত্ত্ব রাজনৈতিক চিন্তার জগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্র এবং আইনকে মান্যতা দেওয়ার ভিত্তি। নাগরিকদের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর আইন প্রয়োগের দাবি করতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্যে এই সম্মতি তত্ত্বের সমর্থন মেলে। সামাজিক চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা **হবস্**-এর মতে, যে চুক্তির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির রাজ্য ত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠন করেছিল, সেই চুক্তি অনুযায়ী রাজার প্রতি প্রজারা নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য। আবার **লক্**-এর মতে রাজা বা শাসক যতক্ষণ মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্মতির অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ হবেন, ততদিন তাঁরা জনগণের আনুগত্য লাভ করবেন। আর শাসক যদি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, জনগণ তখন শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। **রুশোর** মতে, মানুষের সম্মতি নিয়েই রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান হয়েছে। মানুষের ইচ্ছা রাষ্ট্রের ইচ্ছার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মানুষই রাষ্ট্রের আইনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে এবং তাই সে আইনকে মেনে চলে।

(৫) **নৈতিকতার তত্ত্ব :** এই তত্ত্ব অনুযায়ী যখন কোনো আইন বা সরকারি আদেশ নৈতিকতার বিধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় এবং আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে সেই আইন বা আদেশের পিছনে, তখন আমরা সেই আইন বা আদেশকে মান্য করতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়ে পড়ি। পক্ষান্তরে যখন কোনো আইন আমাদের নৈতিক বিচার বিবেচনার সঙ্গে খাপ খায় না, তখন আমরা উক্ত আইনকে মান্য করতে বাধ্য নই। এক্ষেত্রে আমাদের বিবেকের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; এই দ্বন্দ্ব হল আইনগত এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এক্ষেত্রে তারা উক্ত আইনকে অমান্য করতে পারে বা এটার বিরোধিতা করে লাগাতার প্রচার চালাতে পারে। রাষ্ট্র কতখানি জনগণের এই ধরনের কার্যাবলিকে বরদাস্ত করবে, তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রকৃতির ওপর। একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে এই ধরনের কাজ কল্পনাও করা যায় না।

(৬) **ভাববাদী তত্ত্ব :** সাধারণভাবে ভাববাদী বা আদর্শবাদী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রীয় আইন ও আদেশের প্রতি নাগরিকদের প্রশ্নাতীত এবং চরম আনুগত্য দাবি করেন। ভাববাদী মতে, রাষ্ট্র ন্যায় এবং নীতির চরম প্রকাশ; রাষ্ট্র যুক্তির প্রতীক; রাষ্ট্র স্বীকৃত পরিবেশেই কেবলমাত্র ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে পারে। তাই রাষ্ট্রীয় আইন ও আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অর্থই হল ন্যায়, নীতি, যুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। জার্মান ভাববাদী দার্শনিক **হেগেলের** মতে, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য চরম এবং চূড়ান্ত। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক **গ্রিন** (T.H. Green)-এর ধ্যানধারণা কিন্তু হেগেলের মতো ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী নয়। গ্রিনের মতে রাষ্ট্রীয় আদেশ মান্য করা উচিত কারণ রাষ্ট্র সাধারণভাবে যথার্থ সামাজিক আচার-আচরণ গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। এই মান্য করার মধ্য দিয়েই সমাজের নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয়। কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় আদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে অথবা রাষ্ট্র যখন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, রাষ্ট্র যখন নাগরিকের স্বার্থের বিরোধিতা করে তখন রাষ্ট্রীয় আদেশের বিরোধিতা করা একটা স্বীকৃত অধিকার। যখন রাষ্ট্রের অন্যায় আইনের বিরোধিতা বা বাতিলের কোনো সুযোগ থাকে না, তখন রাষ্ট্রের বিরোধিতা কেবল অধিকার নয়, কর্তব্যও। তবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ যেন জনমঙ্গলের (Common Good) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। **ব্র্যাডলে** (Bradley), **বোসাংকেত** (Bosanquet) প্রমুখ ইংরেজ ভাববাদীগণ হেগেলের মতোই রাষ্ট্রের নৈতিক

সত্তায় (moral organism) বিশ্বাসী। তাঁদের মতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই ব্যক্তি তার জীবনে পরিতৃপ্তি ও সুখের সন্ধান পায়।

আদর্শবাদীগণ রাষ্ট্রের ওপর চরম উৎকর্ষ আরোপ করে একটা অবাস্তব, অধিবিদ্যামূলক, অগণতান্ত্রিক তত্ত্বের উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এঁদের মতে, রাষ্ট্র অভ্রান্ত এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের কোনো অধিকার থাকতে পারে না। বাস্তবে তাঁরা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন এবং জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উন্মেষে বড় ভূমিকা পালন করেছেন।

(৭) **ন্যায়বিচারের তত্ত্ব :** এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় আইনকে মান্য করা হয়, কারণ এর সাথে ন্যায়বিচার জড়িত থাকে। আইন ন্যায়নীতি-বিরোধী হলে জনগণ আইন ভঙ্গ করতে পারে। বার্কারের মতে, রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি হল ন্যায়বিচার। তাঁর মতে ন্যায়বিচার একটি সমন্বয়সাধনকারী ধারণা। এটি মানুষের সাথে মানুষের এবং সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। মানুষ রাষ্ট্রের আদেশ এবং কর্তৃত্ব মেনে চলে কারণ, রাষ্ট্র হল ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার পক্ষে চূড়ান্ত আনুগত্য অর্জন করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু ন্যায়বিচারের কোনো সর্বজনীন নীতি নেই। এটি একটি আপেক্ষিক ধারণা। পুঁজিবাদী সমাজে যা ন্যায়বিচার বলে চলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাকে ন্যায়বিচার বলে গণ্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীসে ক্রীতদাস প্রথাকে ন্যায়বিচারের অনুসঙ্গ হিসেবে ভাবা হত, আধুনিক যুগে তা ন্যায়নীতি বিরোধী। আবার আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পুঁজিবাদী সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী হিসেবে ভাবা হয়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এটা ন্যায়সংগত মনে করা হয় না। আসলে যে-কোনো ন্যায়বিচারের ধারণাই হল একটি শ্রেণিগত ধারণা।

(৮) **আনুগত্য সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব :** আনুগত্য সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব অন্য যে-কোনো তত্ত্বের থেকে স্বতন্ত্র। মার্কসবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল শ্রেণি শোষণের যন্ত্র। এটি সবসময় বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থে কাজ করে। রাষ্ট্র যেহেতু সকল শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করে না, তাই রাষ্ট্রের পক্ষে সকলের আনুগত্য অর্জন করাও সম্ভব নয়। দাসভিত্তিক সমাজ থেকে আরম্ভ করে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় বিত্তবান শ্রেণির পক্ষে। যতদিন পর্যন্ত না বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণি রাষ্ট্রের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রকে মান্য করা বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্র তার পুলিশ, মিলিটারি, জেল ইত্যাদির মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষকে রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে কোনো আপত্তি কারও থাকে না। সমাজতন্ত্র ক্রমশ সাম্যবাদী সমাজে উত্তীর্ণ হলে সকল প্রকার শ্রেণি বৈষম্যের অবসান ঘটলে শ্রেণি-স্বার্থের রক্ষক স্বরূপ রাষ্ট্রেও অবসান ঘটবে এবং তখন রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নটিও অবান্তর হয়ে পড়বে।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার সীমাবদ্ধতা : রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কীয় তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এই মতভেদ লক্ষ করে **ডারোথি পিকলস** (Dorothy Pickles) বলেছেন, "Of all the problems of Political Science, the problem of Political obligation is most fundamental."

ঐশ্বরিক তত্ত্ব বলপ্রয়োগের তত্ত্ব, বিশুদ্ধ আইনের তত্ত্ব, হেগেল প্রমুখের ভাববাদী তত্ত্ব প্রভৃতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের কোনো অধিকারকে স্বীকার করে না। তবে নয়া-আদর্শবাদী গ্রিন-এর মতে, রাষ্ট্র যদি 'জনমঙ্গলের নৈতিক আদর্শ' থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করবে। অনুরূপভাবে বেন্থাম প্রমুখ হিতবাদীগণ মনে করে রাষ্ট্র সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধনে ব্যর্থ হলে নাগরিকরা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে পারে। সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে নাগরিকরা সেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে পারে। বার্কারের মতে, রাষ্ট্র যদি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় তাহলে নাগরিকরা সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

স্মরণ করা যেতে পারে, গ্রিন, ল্যাস্কি, বার্কার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ সমর্থন করলেও এই ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত পালনের কথা বলেছেন। গ্রিনের মতে, আইনের বিরুদ্ধাচরণ ক্ষেত্রে দুটি শর্ত পূরণ করা দরকার— (১) আইনের বিরোধিতা যেন সামাজিক স্বার্থের অনুকূলে হয়, এবং (২) এই স্বার্থের ধারণা অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ল্যাস্কি, বার্কারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সমাজকল্যাণের বিষয়টি কোনো অবস্থাতেই উপেক্ষা করতে রাজি নন। বার্কার বলেছেন, রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করতে গিয়ে যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়, তাহলে বিরোধিতার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। তাই তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় আদেশ মান্য করা জনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতাজনিত ক্ষয়ক্ষতি—এই দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয়ক্ষতির পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়।

এঁদের মধ্যে কেউই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের কথা বলেন না, এঁরা শর্তসাপেক্ষে সরকারের বিরোধিতার কথা বলেন। তবে এ ব্যাপারে **মার্কস** ব্যতিক্রম। তিনি বলেছেন, সর্বহারা শ্রেণি বিপ্লবের মাধ্যমে এই শ্রেণি-শোষণমূলক রাষ্ট্র যন্ত্রটির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুক্তি নেই। ক্রমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হলে রাষ্ট্র যন্ত্রটির অবলুপ্তি ঘটবে এবং সমাজ তখনই তার পতাকায় লিখতে পারবে, "প্রত্যেকে তার সাধ্যমতো পরিশ্রম করবে এবং প্রয়োজনমতো ভোগ করবে" ("From each according to his ability to each according to his needs.")।